বিজ্ঞানের এই সময়ে নিদেনপক্ষে যোগাযোগটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আন্তঃজালে প্রায় প্রতিদিনই কথা হয় ওদের। সেটা ছাড়াও ই-মেইল সময় না পেলে দু'দেশের সময় মিলিয়ে অন্তত মিনিট দু'য়েক মুঠোফোনে কথা হবেই ভাই-ভগ্নিতে। এছাড়া আঙুলে আঙুলে কথা বলার মতো ফেসবুকও বাদ যায় না আজকালকার ছেলে-মেয়েদের। ঋভুর খুব ব্যস্তসময় কাটে এমআইটিতে। প্রতিদিন যোগাযোগ হলেও ঋতি কেমন যেন ঋভুর অভাবটা খুব ফিল করে। আজকাল কিছুটা শুকিয়েও গেছে–ফার্স্ট হওয়াটাও ধরে রাখতে পারেনি থার্ড ইয়ারে। এসব দেখে সুলেখা মিত্র ঢাকায় বাসা নেয়; বদরুন্নেছা কলেজের কাছেই ছোট্ট বাসা ঠিক করে দেয় ননদজামাই। ঋতি এখন বাসা আর হোস্টেল মিলিয়েই থাকছে–মা আসাতে পড়া-লেখায় মনোনিবেশ খানিকটা বেড়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু ঋভুর অভাববোধ কিছুতেই ঘোচে না।

বিপদের ধর্মই হলো হঠাৎ আগমন, কোন প্রকারের জানান না দিয়ে। দুর্ঘটনা আরও আকস্মিক। ফোর্থ ইয়ারে কী একটা পরীক্ষা আছে দু'দিন বাদেই। রুমমেট অপলাও চট্টগ্রামের মেয়ে, একই ইয়ারে। দু'জনই পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। তখন রাত দেড়টার কিছু বেশি। বেজে ওঠে ঋতির মোবাইল। ভাঙা বাংলা, দু'-এক শব্দ হিন্দি; মূলত ইংরেজি কণ্ঠই ওদিকটায়।

– আর ইউ ঋতি, আই মিন ঋতি মিত্র?
– ইয়েস স্পিকিং। হু এন্ড ফ্রম হোয়য়ার?
– এমআইটি থেকে দিদি, হাম ত্রিবেণী বলতে হু।

তখন অবধিও ঋতির ধারণা, হয়তো সৌজন্য আলাপ–ঋভুই একবার বলেছিলো, তোকে কথা বলতে হবে না, আমারও ফোন ধরিয়ে দেয়ার দরকার নেই; দেখবি হঠাৎ একদিন ত্রিবেণীদি-ই তোকে ফোন করে অবাক করে দেবে। কিন্তু ফোনের ওপ্রান্ত তখন অপেক্ষা করছে ভয়াবহতম একটি খবর–মিত্র পরিবারের জন্য এ-যাবৎ কালের সর্বাপেক্ষা অসহনীয় ঘটনা।
– ভেরি সরি দিদি। ঋভু নো মোর উইথ আস। ফিফটিন মিনিট বিফোর... রোড এ্যাকসিডেন্ট। ওপ্রান্তে উচ্চস্বরে কান্নার শব্দে কথা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

এদিকে তখন! বুঝতে কয়েক সেকেন্ড কেটেছে মাত্র। ঋভু বলে একবারই চিৎকার। অপলা তাকাতেই দেখে ঋতি পড়ে গেছে। বেড থেকে উঠে ওর ধরার আগেই। অপলার ডাকে আরও বন্ধুরা চলে আসে। চোখে-মুখে পানি দিতেই একবার চোখ খুললো। আরও একবার দিদিভাই বলতেই আবার মূর্ছা। অতঃপর ইমারজেন্সি।

মিত্রপরিবার শোকে প্লাবিত এখন। ঋতি মিত্র হাসপাতাল থেকে ফিরেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। ক্লাশ নেই, পড়া নেই। মা যতটা জোর করে খাইয়ে দেন, ঠিক ততটাই সারাদিনের খাবার। কথাও বলছে না তেমন। কেবল তাকিয়ে একজনকে খোঁজে; চাহনিটা ভীতিপ্রদ–দেখলেই ভয়-ভয় লাগে। আবার কখনও এতটাই চুপচাপ থাকে যে মনে হয় মূর্তির মতোই নিশ্চল। প্রতিদিনই কাশমেটরা আসছে। হোস্টেলের বন্ধুরাও আসছে ঘনিষ্ট কেউ-কেউ রাতে থেকে যাচ্ছে মাসিমার সঙ্গে। ঋভুর বন্ধুরা আসে–নীরবে চোখের পানি মুছতে-মুছতে বেরিয়ে যায়। ডাক্তারও আসছে রোজ। কিন্তু ঋতির অবস্থার বিশেষ উন্নতি নেই। বাবাও ঢাকায় বদলির চেষ্টা করে–কথা দেয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অধ্যাপকের একটা পদ খালি হলেই..। কিন্তু সেই সময়টা আর আসে না, অধ্যাপকের পদও খালি হয় না। এদিকে মায়ের একার পক্ষে মেয়েকে সামাল দেয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে। দেবেন মিত্রের অবসরের সময় হয়নি, তবে স্বেচ্ছায় যেতে আপত্তি নেই। আরও বছরতিনেক থাকতে পারতেন। কিন্তু মাস তিনেকের মাথায় স্বেচ্ছা-পেনশনের আবেদন নিয়েই ঢাকায় আসে; মেয়েকে সুস্থ করে তোলাই এখন বাবা-মায়ের একমাত্র কাজ। মেয়ের জন্য বাসায় ঋভুকে নিয়ে কথাও বলা যায় না। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরও কয়েকবার মূর্ছা গেছে ঋতি। ডাক্তার বলেছেন–ওর সামনে ছেলের কোন প্রসঙ্গ তোলাই বারণ।

এভাবেই ফোর্থ ইয়ারটা মিস হয়। মেয়ের সঙ্গে রাত জেগে বসে থাকেন সুলেখা। মেয়েকে ক্লাশে পাঠিয়ে মা বসে থাকেন সিঁড়ির ওপরে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক'টা পরীক্ষাও দেয়ানো সম্ভব হয়। হোস্টেলেও থাকছে মাঝে-মাঝে–তবে সঙ্গে সুলেখা মিত্র। বান্ধবীরা প্রায় সবাই ছ-মাস এগিয়ে গেছে। কিন্তু সবারই চিন্তা ঋতিকে নিয়ে। প্রফেসররা প্রতিদিনই ঋতির খোঁজ নিচ্ছে। কেউ-কেউ কথা বলছে রোজ। খুব স্বাভাবিক না হলেও এখন ক্লাশগুলো করছে ঋতি। বন্ধুরা যখন ফাইনাল দেয়ার প্রস্'তি নি"ছ, তখন ঋতি টেনে-টুনে ফোর্থ ইয়ার পেরুলো।